জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ

৬৫তম অধিবেশন

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতিসংঘ

নিউইয়র্ক

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি বিশ্বাস করি, আপনার প্রাজ্ঞ ও দৃঢ় নেতৃত্বে এই অধিবেশন সর্বাত্মকভাবে সফল হবে। ৬৪তম অধিবেশন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমি ঐ অধিবেশনের সভাপতি ড. আলী আবদুস সালাম ট্রেকি-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসংঘের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য মহাসচিব মি. বান কি মুন-কে জানাচ্ছি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সম্মানিত সভাপতি,

৩৬ বছর আগে আমার পিতা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার সেবায় জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

তারপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আজও জাতিসংঘ সারাবিশ্বের বিপন্ন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের শেষ ঠিকানা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ আজ একটি উদার, প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জাতিসংঘের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং দায়িত্ববান সদস্য। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের সকল উদ্যোগের প্রতি বাংলাদেশ পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

দেশ এবং দেশের বাইরে বৈরি শক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ করে, সন্ত্রাসবাদ দমনে, বাংলাদেশ কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যেসব ব্যক্তি হত্যা, নারী ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগের মত গুরুতর মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে আমরা যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছি। আমাদের এই উদ্যোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম ঘোষণার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করেছে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা। আমি বিশ্বাস করি, কেবল সুবিচারই পারে অতীতের অমার্জনীয় ভুলের নিরাময় করতে।

এ প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করতে চাই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বাংলাদেশে সংঘটিত নারকীয় হত্যাকাণ্ডে কথা। সেদিন সন্ত্রাসীরা আমার পিতা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমার পরিবারের ১৮জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। আমার মা, তিন ভাই -

শেখ কামাল, শেখ জামাল, দশ বছর বয়সের ছোট ভাই শেখ রাসেল ও দুই ভাইয়ের স্ত্রীকেও সেদিন হত্যা করা হয়েছিল।

১৯৮১ সালে দেশে ফেরার পর বার বার আমার উপর হামলা হয়েছে। বিশেষ করে ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত, যখন আমরা বিরোধীদলে ছিলাম তখন সংখ্যালঘুসহ অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে তৎকালীন বিএনপি-জামাত সরকারের সময়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট আমার শান্তিপূর্ণ সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল; ২৪ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্ত্রী, আমার দলের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আইভি রহমানও সেই হামলায় নিহত হয়েছিলেন। গুরুতর আহত পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী এখনও পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার পরিবার বারবার সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছি। কিন্তু সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করিনি। আমি পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই বাংলাদেশের মাটিতে আমরা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেব না। এজন্য আমরা ইতোমধ্যেই জাতিসংঘের সন্ত্রাস বিরোধী সকল কনভেনশনের অনুমোদন দিয়েছি।

আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি বলেই ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি করে জাতিগত সংঘাত নিস্পত্তি করেছিলাম। ২০০৯ সালে শান্তিপূর্ণভাবে বিডিআর বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমি বিশ্বাস করি, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শান্তি এবং স্থিতিশীলতা। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে আমরা তার প্রমাণ দিয়েছি। ১৯৮৮ সালে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৪ টি দেশে ৩২টি মিশনে ৯৭ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেছে। এসব শান্তি মিশনে আমরা আমাদের ৯২জন বীর সেনানীকে হারিয়েছি। বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সেনা প্রেরণকারী দেশ।

সম্মানিত সভাপতি,

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খাদ্যনিরাপত্তা, আবাসন ও জীববৈচিত্র আজ হুমকির মুখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, সাইক্লোন মানুষের ক্ষতি করছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের কারণেই এ অবস্থা। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে দায়ী না হয়েও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ফলে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। তবে বাংলাদেশ এই ক্ষতি মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আমরা ১৩৪টি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নদীগুলোর ড্রেজিং করা, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্বাসনের জন্য চাষযোগ্য জমি পুনরুদ্ধার এবং খাদ্য উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও রয়েছে কার্বন আধার তৈরি। ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জমিকে বনায়নের আওতায় আনা এবং সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে সমুদ্র উপকূল রক্ষা করা। আমরা জনগণকে সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি, পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খায় এমন ধরনের শস্যের জাত উদ্ভাবনে গবেষণার কাজ করে যাচ্ছি।

ইতোমধ্যেই সমুদ্র উপকূলে দুর্যোগকালীন আশ্রয়ের জন্য ১৪ হাজার আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আরও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এজন্য আমাদের প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থের। আশু ব্যবস্থা হিসেবে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে একটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় একই ধরনের আরেকটি তহবিল গঠন করেছি। আমি বিশ্ব সম্প্রদায়কে এসব তহবিলে উদার হাতে অনুদান প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি যাতে বাংলাদেশ তার টিকে থাকার সংগ্রামে সফল হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গত বছর COP-15 সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি আশা করি, মেক্সিকো-তে COP-16 সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একটি সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক চুক্তিতে উপনীত হতে পারবেন।

বাংলাদেশ, ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমুহ এবং হিমালয় অঞ্চলসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মানুষের ভাগ্য বিপর্যয়রোধে তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে আমি উন্নত বিশ্বের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

সম্মানিত সভাপতি,

বিশ্বঅর্থনৈতিক মন্দা থেকে আমরা এখনও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি। মন্দার কারণে অনেক উন্নত দেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্রেটনউড ইনস্টিটিউশনগুলোকে উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে তাদের সহায়তা আরও জোরালো করতে হবে। এই সংস্থাগুলো সেখানে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন সহায়তা দিতে পারে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি এসডিআর এবং অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের আওতায় একটি বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করছি। আমরা সকল স্টেকহোল্ডারকে আক্রা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও সহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানাচ্ছি।

উন্নত বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। তবে, শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার এবং বাণিজ্য উদারিকরণ করা হলে স্বল্পোন্নত দেশগুলো আরও লাভবান হতে পারবে।

পাশাপাশি আমরা ডব্লিউটিও বাণিজ্য আলোচনার দোহা রাউন্ডের সফল সমাপ্তি চাই। একইসঙ্গে ব্রাসেলস কর্মপরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওইসিডি দেশগুলোর জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এবং ০.২ শতাংশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বল্পোন্নত দেশগুলো নিজ দেশের বেকার সমস্যার পাশাপাশি বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রেও অভিবাসন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এসব দেশের জাতীয় আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে রেমিটেন্স থেকে। এজন্য তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উন্নত দেশগুলোতে অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্মানিত সভাপতি,

বাংলাদেশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যথেষ্ট সফল হয়েছে। গত বছর আমাদের প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশ। খাদ্য উৎপাদন, কৃষি, গ্রামীন উন্নয়ন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য ও জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

১৯৯৬-২০০১ সময়ে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছিল। ফলে, আমরা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মর্যাদাপূর্ণ 'সেরেস' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছিলাম। এবারও জ্বালানি, সার, বীজ এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে আমরা জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়ন করছি। আমাদের সরকার সবার জন্য খাদ্য সরবরাহ করতে সফল হয়েছে।

আমাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি এবং সবার কাছে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার কাজ করছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামীণ জনপদসমূহকে ইন্টারনেট সেবার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। গ্রামীণ জনপদের জন্য ই-সেন্টার কর্মসূচির আওতায় ৮হাজার ৫০০ ডাকঘরকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০০৯ সালে আমরা ১০০ ইউনিয়ন পরিষদে ই-সেন্টার স্থাপন করেছি এবং এ বছরের মধ্যে আরও ৪ হাজার ৫০০ ইউনিয়ন পরিষদকে এর আওতায় আনার কাজ চলছে।

হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা, ই-গভর্নেন্স নেটওয়ার্ক, স্যাটেলাইট ও টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার কাজ এগিয়ে চলছে।

আমাদের তথ্য ও প্রযুক্তি সেবা কৃষি তথ্য সরবরাহ, কৃষিপণ্যের বাজারে প্রবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাষ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, এবং সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

সংসদ সদস্য, সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য ই-লিডারশীপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগামী ২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এ সময়ের মধ্যে আমাদের সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর।

আমাদের সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুকে স্কুলে ভর্তি ও ২০১৪ সালের মধ্যে শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এজন্য বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা বিনাবেতনে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি বাড়াতে কিছু কিছু হতদরিদ্র এলাকায় তাদের জন্য দুপুরের খাবার এবং অভিভাবকদের আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তবে, এই ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সকলক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এজন্য আমরা স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

আমরা 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা' গ্রহণ করেছি। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, সংসদ উপনেতা ছাড়াও পাঁচজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নারী। সংরক্ষিত আসনে ৪৫ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছে। এছাড়াও ১৯ জন নারী সংসদ সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

স্থানীয় সরকারে নারীদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীসহ সকল পেশায় নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের নারীরা আজ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনেও কাজ করছেন।

আমরা দুঃস্থ ও বিধবা নারীদের ভাতা প্রদানসহ বৃদ্ধ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবস্থা করেছি। সমাজের সংখ্যালঘু, প্রান্তিক এবং শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প এবং নগদ অর্থ ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার ফলে নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষ করে, জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল শস্যজাত উদ্ভাবনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। সম্প্রতি 'পাটের জন্ম ইতিহাস' আবিষ্কারের ফলে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনসহ আমরা পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে যাওয়ার সুযোগ পাব বলে আশা করছি।

স্বাস্থ্যখাতকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি। গ্রামের প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য আমরা একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। বর্তমানে প্রায় দশ হাজার ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। মোট ১৮ হাজার ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। নিরাপদ মাতৃত্ব ও মাতৃস্বাস্থ্যের জন্য একটি জাতীয় কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০ মাসে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২.৯ থেকে কমে ২.৬ এ এসেছে। এক বছরের কমবয়সী শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫২ থেকে কমে ৪১ এ এসেছে। জাতিসংঘ পুরস্কার দিয়ে আমাদের এই সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে হাজারে ১৫ এবং মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে হাজারে ১.৫ এ নামিয়ে আনা।

২০১৪ সালের মধ্যে আমরা ১০০ শতাংশ টিকা প্রদান সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছি।

বিগত বছরগুলোর খাদ্য, জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন এবং শিশুমৃত্যু হ্রাসে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি এবং আমরা সঠিক লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছি।

সম্মানিত সভাপতি,

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ২১শে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মানুষ আজ বাংলায় কথা বলেন। এ ভাষার রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাহিত্য। এজন্য গত বছর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত সভাপতি,

প্রযুক্তি আজ সারাবিশ্বকে একটি অখন্ড গ্রামে পরিণত করেছে। প্রতিদিনই বিশ্বের মানুষ আরও কাছাকাছি আসছে। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ এবং অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার মত চ্যালেঞ্জগুলো আরও প্রকট হচ্ছে। আমাদের গন্তব্য যেমন অভিন্ন, তেমনি অভিন্ন আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও।

মানবতার শত্রু দারিদ্র্য। দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের জয়ী হতে হবে।

আমরা এই বিশ্বকে আগামী প্রজন্মের জন্য শান্তিপূর্ণ বিশ্ব হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। তাদের জন্য সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে চাই। আসুন, আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি।

মাননীয় সভাপতি, আপনাকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
জাতিসংঘ দীর্ঘজীবী হোক।